দৈনিক
জনকণ্ঠ

29 MAY 2017
২০ ... ৬

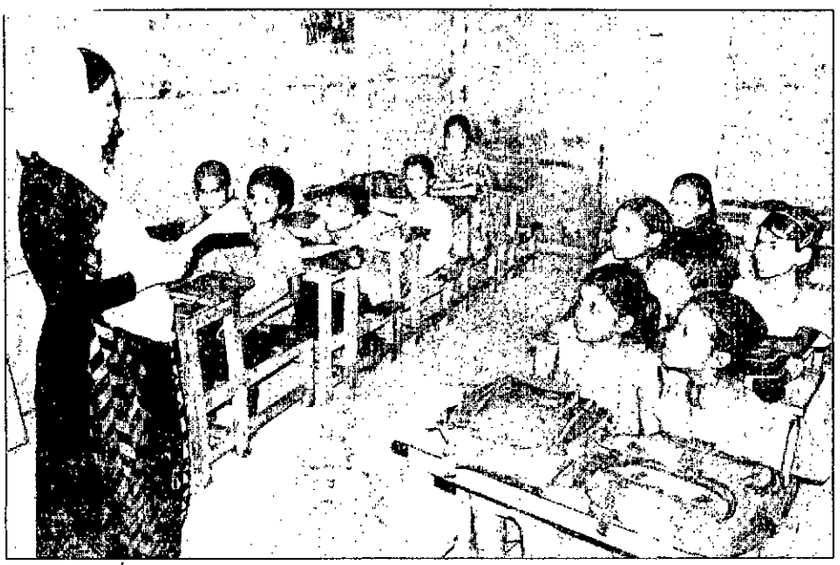

গ্রামবাংলা স্কুলের একটি ক্লাসরুমে শিক্ষিকা বর্জ্যজীবী শিশুদের পড়াচ্ছেন

বর্জ্যজীবী শিশুদের কেউ ডাক্তার-শিক্ষক, কেউবা পুলিশ হতে চায়

[illegible] ছোট ঘরগুলোর দেয়ালে শিশুদের জন্য ছোট বড় রঙিন শিক্ষণীয় পোস্টার সাঁটানো। সাজানো বেঞ্চগুলোতে সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছে শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি ঘরে একজন করে শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা শিশুদের পড়াচ্ছেন। এটি বর্জ্যজীবী পরিবারের শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা গ্রামবাংলা স্কুলের চিত্র। রাজধানী ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার মাতুয়াইলে ডাম্পিং স্টেশনে কর্মরত বর্জ্যজীবী পরিবারের [illegible] পৌঁছে দিতে চাইছে [illegible], সিপ লটারি ফান্ডের সহায়তায় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই গ্রামবাংলা স্কুল। ২০০৮ সাল থেকে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি বর্জ্য শ্রমিকদের উন্নয়নে শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামবাংলা স্কুলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ২০০ বর্জ্যজীবী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পাশে রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা মাতুয়াইল ডাম্পিং সাইটের বর্জ্যজীবী পরিবারের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে এসব শিশুর বসবাস। কিন্তু স্কুলে পড়াশুনার পাশাপাশি শিখেছে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে [illegible] খাওয়া। পরিষ্কার [illegible]

[illegible] দুপুর দেড়টায় গ্রামবাংলা স্কুলে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিটি ক্লাসরুম পরিপূর্ণ। আরিফা, তামান্না, গোলাপীরা স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থী। তারা প্রত্যেকেই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ময়লা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। মা-বাবার দেখাদেখি তাদেরও বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়। বর্জ্যজীবী জরিনা বানুর স্বপ্ন থাকলেও সাধ্য নেই।

(১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

বর্জ্যজীবী শিশুদের

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

গত বছরে গ্রামবাংলা স্কুল থেকে তার দুই মেয়ে ৫ম শ্রেণী পাস করেছে বিনা বেতনে। সাধ্য না থাকা সত্ত্বেও জরিনা তার দুই মেয়েকে মাতুয়াইল উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করেছে। আরিফা, তামান্নার মতো মরিয়ম, আশা ও তাহমিনাদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া। এদের কেউ ডাক্তার, শিক্ষিকা আবার কেউ পুলিশ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এরা সবাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম। ময়লা সংগ্রহের পাশাপাশি এসব শিশু পড়াশুনা করছে, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ২০১৬ সালের পিইসি পরীক্ষায় এ স্কুলে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

এ বছরে পিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাহমিনা। ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষিকা জানালেন সে একজন মেধাবী ছাত্রী। তাহমিনা বলল, পড়ালেখা করতে তার খুব ভাল লাগে। তবে ময়লা সংগ্রহের কাজে সময় দিতে হয় বলে মাঝেমাঝে পড়ালেখার অসুবিধা হয়। বড় হয়ে সে একজন শিক্ষিকা হতে চায়। কিন্তু এ কথাটি বলার সময় তার চোখে মুখে দ্বিধা ছিল স্পষ্টত। কারণ, দারিদ্র্য যে তার এই স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারে এই বিষয়টি বোঝার বয়স হয়ত তার হয়েছে। ক্লাসের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বেবি নাজনীন আক্তার। গোলগাল ফর্সা হাতে পায়ে গড়নে চোখে পড়ার মতো বেবি চিকিৎসক হতে চায়।

বেবির বাবা নেই। মা ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ করে। বেবির মাকে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সন্তানের দেখভাল করার সাধ্য নেই। খুব দ্রুত পাত্রস্থ করতে চায়। কিন্তু স্কুলের পক্ষ থেকে শিশু বিবাহ আইনের জটিলতার পরামর্শ দিয়ে বেবির পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করছে।

ছোটবড় শিশুদের কলকাকলীতে তখন মুখরিত গ্রামবাংলা স্কুলটি। এর প্রত্যেকেই নিজেদের সমান মনে করে। নেই তাদের মধ্যে ভেদাভেদ। এদের মধ্যে অনেকেই যখন সরকারি স্কুলে ভর্তি তখন এরা বর্জ্যজীবী শিশু বলে সহপাঠিদের কাছ থেকে অপমানিত হয়। কিন্তু গ্রামবাংলার স্কুলটিকে এসব শিশুরা নিজেদের বাড়ি বলেই মনে করে বলে জানালেন স্কুলে একাধিক শিক্ষিকা। এ স্কুলে বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০৪ জন। এদের জন্য রয়েছে ১০ জন শিক্ষক। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ম্যানেজার আবুল বাশার খান রেজা জনকণ্ঠকে বলেন, 'এসব শিশুরা স্কুলটিকে নিজের পরিবার বলে মনে করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাদের অনেক যত্নে পড়ালেখা শেখান। এই স্কুল থেকে পড়াশুনা শেষ করা ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে ভাল স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়। সামান্য সুযোগ পেলে এসব ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

বর্জ্য শ্রমিকদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কাজ করার উদ্যোগ নেন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ। ছোট ছোট এসব শিশু মায়ের সঙ্গে বর্জ্যস্তূপে থাকার বিষয়টি তিনি মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েই তাদের উন্নয়নে কাজ করার প্রয়াস ঘটান। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি বর্জ্যজীবীদের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন তাদের বুঝিয়েছেন শিক্ষার গুরুত্ব। সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্জ্যজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে গ্রামবাংলা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার্থীদের জন্য নিবন্ধনের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কম মূল্যে তাদের পরিবারের অন্য সদস্য যেমন বাবা, মা, ভাই, বোনদের নিয়ে ৫৭৩ জনের জন্মনিবন্ধন তৈরি করে দেন। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য নিজেদের ফান্ড থেকে লেমিনেটিং করে দিয়েছেন।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে ওঠা এসব শিশু পিতামাতার দেখাদেখি ময়লার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে। এক সময় তারাও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও প্রায়শই জ্বর, টাইফয়েড, চর্মরোগ, হেপাটাইটিস, অমাশয়, যক্ষ্মা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষত বা অঙ্গহানী ইত্যাদি সংক্রামণ বা অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি এসব শিশুকে পড়ালেখা শেখানোর পাশপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। যেমন-খালি পায়ে না হাঁটা, ময়লা সংগ্রহের সময় অবশ্যই বুট জুতা, হাতে গ্লাভস পড়া, হাতের নখ ছোট রাখা, সব সময় পরিষ্কার থাকা, খাবার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ও শিশুদের ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বর্জ্যজীবী পরিবারের এসব মেধাবী শিশু। সাধারণত সকালে যে সময় শিশুদের জন্য সরকারী বা বেসরকারী স্কুলগুলো শুরু হয় ঠিক সে সময় সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনার ট্রাকগুলো বর্জ্য ফেলতে আসে ডাম্পিং স্টেশনে। আর সে সময় শত শত শিশু-নারী-পুরুষরা ট্রাক ও বুলডোজারের ঝুঁকি উপেক্ষা করে বর্জ্য সংগ্রহ করতে আসে। এই ব্যস্ত সময়ে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর মায়েদের থাকে না। তাছাড়া ৩-৪ জন বাচ্চা নিয়ে কোন মালিকের অধীনে কাজও করার সুযোগ পায় না।

আবার অনেক মা-বাবাও চায় তার সন্তান স্কুলে না যেয়ে বর্জ্য সংগ্রহে সাহায্য করবে। তবে এ ধারণা অনেকটায় কমিয়ে এনেছে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি। এখন অনেক বর্জ্যশ্রমিক তাদের সন্তানদের এসে স্কুলে রেখে যায়। তারাও চায় তাদের সন্তানরা শিক্ষিত হোক। দেশে আনুমানিক নারী ও শিশুসহ ৪ লাখ লোক 'বর্জ্যজীবী' পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের জীবন ও জীবিকা টিকিয়ে রেখে চলেছে। এসব শ্রমজীবী যদি বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়ে তবে দেশের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ এসব শ্রমজীবী ও তাদের শিশু উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করে বর্জ্যজীবীরা।